অগোচরে অপরাধ

বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

AMNESTY INTERNATIONAL

Rapid Action Battalion (RAB) কর্মকর্তারা ৩ জুন ২০১১ বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের জেলা নরসিংদীর নিকটবর্তী এক বস্তিতে রহিমা খাতুনের মাথায় গুলি করে। (RAB) কর্মকর্তারা রহিমার স্বামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা করলে ৩৫ বছরের রহিমা খাতুন তাদেরকে বাধা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে তাদের একজনের ছোড়া গুলিতে সে মারাত্মকভাবে জখম হয়। পরবর্তীতে নিবিড় মেডিকেল চিকিত্সা পেয়ে সে আশঙ্কামুক্ত হয় এবং মাদক ব্যবসার অভিযোগে তাকে আটক রাখা হয়েছে। তথ্য মতে, (RAB) দ্বারা গুলিবিদ্ধ হওয়া তিনিই প্রথম নারী।

বাংলাদেশে এমন সপ্তাহ খুব কমই যায়, যে সপ্তাহে RAB-এর গুলিতে কেউ মারা যায় না। RAB হলো বিশেষ পুলিশ বাহিনী, যাদেরকে দেশজুড়ে সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই বাহিনীর কাজকর্ম ইতোমধ্যে জনগণ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এযাবত্কালে RAB কমপক্ষে ৭০০ লোককে বেআইনীভাবে হত্যা করেছে। যার মধ্যে অন্তত পক্ষে ২০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে বর্তমান আওয়ামী সরকারের শাসনামলে, যদিও প্রধানমন্ত্রী বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই ধরনের মৃত্যুকে সাধারণত দুর্ঘটনাজনিত বলে চালিয়ে দেওয়া হয় কিংবা বলা হয় RAB কর্মকর্তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি করায় "ক্রসফায়ার" এ মারা গিয়েছে। অনেক ঘটনায়, শিকার ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর হত্যা করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও, এই ধরনের মৃত্যুগুলোর ক্ষেত্রে RAB কিংবা সরকারের বিচারবিভাগীয় তদন্ত শেষে কখনোই বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলাফল গোপন থাকার সুবাদে, RAB বেআইনী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো অব্যাহতভাবে অস্বীকার করে আসছে। RAB কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সদস্যদের অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। RAB-এর বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার মাধ্যমে বাংলাদেশের পূর্বাপর সরকারগুলো এই ধরনের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে RAB-এর দাবী ও আচরণকে কার্যকরভাবে অনুমোদন করছে।

RAB-এর ব্যাপক নির্যাতন ও অত্যধিক বলপ্রয়োগের মতো ঘটনা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এমন অভিযোগ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ RAB সদস্যদের বিচারের কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

RAB ২০০৪ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত কমপক্ষে ৭০০ মানুষের খুনের সঙ্গে জড়িত হয়েছে।

উপরে: পোশাক কারখানার একজন শ্রমিকের সঙ্গে RAB কর্মকর্তাদের সংঘর্ষ, জুন ২০১০। প্রকাশিত তথ্য মতে, সরকার RAB- এর পদ্ধতিগত নির্যাতন ও অত্যধিক বল প্রয়োগের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে উদাসীন।
কভার পৃষ্ঠা: ছবিটি শহিদুল আলমের বাংলাদেশের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ক্রসফায়ার থেকে নেয়া হয়েছে। মার্চ ২০১০ সালে উদ্বোধনের শুরুতে কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীটি নিষিদ্ধ করেছিল। © শহিদুল আলম/দৃক/মেজরিটি ওয়ার্ল্ড

লিমন হোসেন

“এই মুহূর্তে আমি অন্য কারো কাছে নয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করছি।”

লিমন হোসেন, ১৬ বছরের এই কিশোরকে RAB কর্মকর্তারা গুলি করেছিল, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে আলাপকালে জুন ২০১১ একথা বলেছেন

© অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

ষোল বছরের ছাত্র লিমন হোসেনকে ২০১১ সালের ২৩ মার্চ RAB কর্মকর্তারা ঝালকাঠিতে পায়ে গুলি করে। তার জখম এতোটাই মারাত্মক ছিলো যে, চারদিন পরে তার পা কেটে ফেলতে হয়েছে। লিমন হোসেনের পরিবার জানিয়েছে, মাঠ থেকে গবাদি পশু বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার পথে লিমনকে গুলি করা হয়। RAB-এর শিকার অন্য পরিবারগুলোর মতোই লিমনের পরিবারও জানিয়েছে যে, কোন কারণ ছাড়াই RAB লিমনকে গুলি করেছে, এবং এই ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা উচিত।

ঘটনার পরপর এক সংবাদ সম্মেলনে RAB-এর মহাপরিচালক স্বীকার করেন: “লিমন হোসেন কুখ্যাত কোন অপরাধী নয় তবে সে RAB-এর ও অপরাধীদের গোলাগুলির ঘটনার শিকার।” কিন্তু পরবর্তীতে RAB-এর কর্মকর্তাগণ এই বিবৃতি থেকে সরে আসে; জানায় যে, গুলি করাটা যথার্থ ছিলো, এবং লিমন একটি অপরাধী দলের সদস্য। তারা দাবী করে, দুষ্কৃতকারীরা প্রথমে গুলি ছুড়তে শুরু করে এবং RAB পাল্টা গুলি ছুড়লে লিমন আঘাত পায়। লিমন, নিজে অপরাধী কিংবা কোন অপরাধ চক্রের সদস্য হওয়ার বিষয়টি অব্যাহতভাবে অস্বীকার করে আসছে।

সরকারি কর্মকর্তাগণ, এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় RAB-এর বক্তব্য ও তথ্যকে সমর্থন জানিয়ে ঘটনার তদন্তে একটি পৃথক সরকারি তদন্ত দল গঠনের কথা বলে। সেই প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করা না হলেও জানা যায় তদন্তকারী দল জানতে পেরেছে যে, লিমন কিংবা তার পরিবার কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল না।

“এই মুহূর্তে আমি অন্য কারো কাছে নয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করছি,” অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে একথাই বলেছে লিমন। সে আরো বলেছে, “নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত দল যদি আমার দোষ খুঁজে পায় আমি চাই তারা আমাকে শাস্তি দিক। আর যদি না পায়, তবে আমি তাদের শাস্তি চাই যারা আমার পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করার আগে আমার জামার কলার চেপে ধরে রেখেছিল।”

তদন্তের শুরু থেকেই পুলিশের তদন্ত কার্যক্রমকে পক্ষপাতপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। পুলিশ RAB-এর অভিযোগের ভিত্তিতে লিমন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা তদন্ত করেছে অথচ তারা RAB-এর বিরুদ্ধে লিমনের মায়ের অভিযোগ গ্রহণ করেনি। হেনোয়ারা বেগমের মতে, RAB-এর সদস্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে তার গুলিবিদ্ধ সন্তানকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধকে উপেক্ষা করেছে। তিনি বলেন, তারা যদি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতো তাহলে হয়তো লিমনের পা কাটতে হতো না। থানা পুলিশ হেনোয়ারা বেগমের অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তিনি আদালতের শরনাপন্ন হন এবং ২৬ এপ্রিল আদালত পুলিশকে অভিযোগ নথিবদ্ধ করার আদেশ দেয়, তবে তারা আরো কোন ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা সেকথা জানা যায় না।

RAPID ACTION BATTALION (RAB)

বাংলাদেশের, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি মোকাবেলায় সরকার ২০০৪ সালের মার্চ মাসে RAB-এর গঠন করে। রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা বিভাগের জেলাগুলোতে সশস্ত্র অপরাধী দলগুলো কিংবা শক্তিশালী ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে গোপনচুক্তির ভিত্তিতে চোরাকারবার পরিচালনা কিংবা স্থানীয় জনগণকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করছিল।

RAB-এর বাহিনী গঠনের কয়েকমাসের মধ্যে RAB-এর অভিযানগুলো খুনের একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিচিতি পায়, যাকে কর্তৃপক্ষ বলছেন "ক্রসফায়ারে মৃত্যু"। এমন অনেক মৃত্যুতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সুস্পষ্ট। দেখা যায়, সন্দেহভাজনকে গ্রেফতারের পর নির্জন স্থানে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে। কোন কোন ঘটনায় গ্রেফতারের প্রত্যক্ষদর্শী থাকলেও RAB-এর কর্তৃপক্ষ তাদের দাবীতে অটল থেকেছে। জানিয়েছে যে, ঘটনার শিকার ব্যক্তি "ক্রসফায়ার", কিংবা "গোলাগুলি" কিংবা "বন্দুকযুদ্ধে" মারা গিয়েছে।

দায়মুক্তি

RAB-এর বিরুদ্ধে বেআইনী হত্যাকান্ডের প্রায় সকল অভিযোগ শাস্তিবিহীন রয়ে গেছে। এমন ধরনের হত্যা বন্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আহ্বানকে উপেক্ষা করে সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অবস্থানে অটল থেকেছে। RAB-এর কর্মকান্ডের প্রতি জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন এব্যাপারে সরকারের নিজ দায়িত্ব এড়ানো সহজতর করেছে।

দায়মুক্তির সংস্কৃতি RAB-এর নির্যাতন ও অপব্যবহারের ঘটনাগুলোর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার তদন্ত প্রতিহত করছে। RAB-এর নির্যাতনের শিকার ২০টিরও বেশি পরিবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে জানিয়েছে যে, আদালতের আদেশ পেতে আবেদন না করা পর্যন্ত পুলিশ RAB-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরপর যদিওবা পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু তারা অভিযোগের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ধরনের কোন মামলার ঘটনা বিচারের মুখ দেখেনি।

RAB-এর কর্মকর্তারা ২০০৯ সালের ১০ জুলাই সন্ধ্যায় তপন, কামাল, পাপ্পু ও হৃদয়কে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারা চারজনই গুলিবিদ্ধ ছিল। RAB দাবী করে যে, ওই ব্যক্তিরা RAB কর্মকর্তাদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধকালে জখম হয়েছে, কিন্তু আহতদের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, তারা জখম হওয়ার কয়েকঘন্টা আগেই RAB তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তপনের জখম সারেনি, সে মারা যায়। বাকি তিনজনকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করে কারাগারে পাঠানো হয়। বেঁচে যাওয়া তিনজনের একজন একটি মানবাধিকার সংস্থাকে জানিয়েছেন, RAB গুলি করার আগে তাদেরকে একটি গাছের সামনে দাড়াতে বাধ্য করে, তারপর তাদের হাঁটুর ঠিক নিচে গুলি করা হয়।

RAB-এর কর্মকান্ডের দায়মুক্তির ঘটনাগুলো থেকে এমন পরিবেশ তৈরি হতে পারে যেখানে অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলো, যেমন, পুলিশ বিভাগ বিশ্বাস করতে পারে, তারাও লংঘনের ঘটনায় একইভাবে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা এড়াতে পারবে। ২০১০ সালের শুরু থেকে এপর্যন্ত শুধুমাত্র পুলিশী অভিযানে কমপক্ষে ৩০ জন ব্যক্তি খুন হয়েছেন, যাদের মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ বিভাগ থেকে বলা হয়েছে তারা "গোলাগুলিতে" কিংবা "বন্দুকযুদ্ধে" মারা গিয়েছেন।

RAB-এর ও পুলিশের সন্দেহজনক বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিৎ এবং কাউকে দায়ী পাওয়া গেলে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা উচিৎ। এই ধরনের কর্মকান্ড বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের পূর্বাপর সরকারগুলোকে এর দায়-দায়িত্ব বহন ও জবাবদিহি করতে হবে।

প্রতিটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানে নিহত কিংবা আহত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা
জানুয়ারি ২০১০ – জুন ২০১১

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক উল্লেখিত সময়কালের সংবাদপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত। এই ধরনের অভিযানগুলোতে খুন হওয়া মোট ১২৫ জন ব্যক্তির মধ্যে ৯৩ জন RAB-এর হাতে, ৩০ জন পুলিশের হাতে এবং বাকি ২ জন অন্য বাহিনীগুলোর হাতে মারা গিয়েছে।

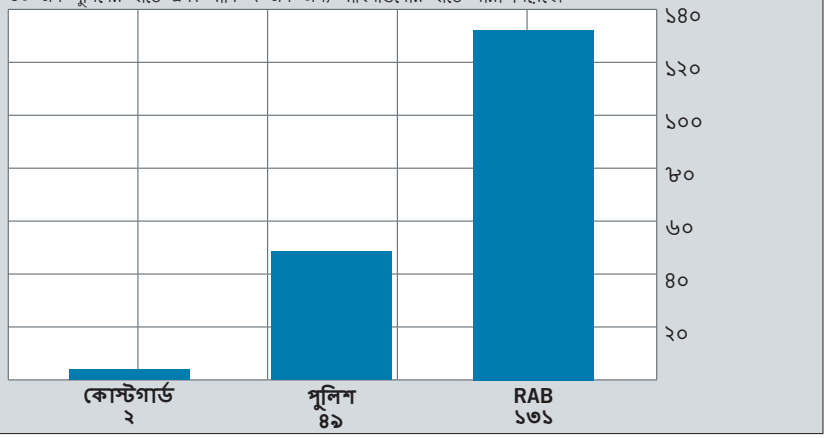

© প্রাইভেট

© প্রাইভেট

© প্রাইভেট

“ক্রসফায়ার”, “গোলাগুলি”, “বন্দুকযুদ্ধ” না হত্যাকাণ্ড?

শুরু থেকেই RAB-এর “ক্রসফায়ার” সংক্রান্ত অনেক গল্প বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, এবং RAB-এর ঘটনা বর্ণনায় বিসদৃশতা ছিল, কারণ RAB-এর দাবীকৃত ক্রসফায়ারে মৃত্যুর অনেকগুলো ঘটনায় হত্যার শিকার ব্যক্তিকে RAB-এর প্রথমে গ্রেফতার করেছে পরে ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে।

“ক্রসফায়ার” গল্পগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে RAB-এর একজন মুখপাত্র অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে ২০১০ সালের মে মাসে বলেছেন যে, বাহিনী এখন “ক্রসফায়ার” শব্দটি ব্যবহারে অনিচ্ছুক কারণ “এটি ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করছে; সবাই মনে করছে ঘটনাস্থলে হঠাত উপস্থিত হওয়া কাউকে মেরে ফেলা হচ্ছে”। তিনি বলেন যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগ অপরাধী, যারা প্রথমে RAB বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে গোলাগুলি শুরু করেছিল।

এই ধরনের বর্ণনা RAB এখন গণমাধ্যমে কথা বলার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১১ সময়কালে RAB কর্তৃক ৮৮টি গুলির ঘটনার মধ্যে মাত্র চারটি ঘটনাকে RAB “ক্রসফায়ার” বলে উল্লেখ করেছে এবং বাকিগুলোকে “গোলাগুলি” কিংবা “বন্দুকযুদ্ধ” বলে চালিয়েছে।

এই ধরনের মৃত্যুর ঘটনাগুলোকে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, এগুলো সন্দেহজনক বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড।

কৈফিয়তবিহীন মৃত্যুগুলো

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, RAB মৃত্যুগুলো কিভাবে হলো তার কোন ব্যাখ্যাও দেয় না। যেখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা RAB-এর হাতে আটক হওয়ার কথা বলছে সেই আটককৃত মানুষগুলো কিভাবে পরবর্তীতে মারা গেল সেনিয়ে RAB -এর দিক থেকে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না।

নাজমুল হক মুরাদ, ফোরকান আহমেদ ও মিজানুর রহমান ১৭ এপ্রিল ২০১০ থেকে নিখোঁজ হন। মুরাদ, একটি হত্যা মামলার পলাতক আসামী, তার ভাইয়ের সঙ্গে ১৭ এপ্রিল দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সেই দেখা আর হয়নি। ১৮ এপ্রিল একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি মুরাদের ভাইকে ফোনে জানায় যে, মুরাদ RAB-এর জিম্মায় রয়েছে। হত্যা মামলায় আসামী পক্ষের একজন আইনজীবিও ১৮ এপ্রিল মুরাদের পরিবারকে জানিয়েছিল যে, মুরাদ RAB-এর জিম্মায় রয়েছে। তার পরিবারের সদস্যরা অনেক চেষ্টা করেও ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত তার কোন হদিস বের করতে পারেনি, ওইদিন ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় তার লাশ পাওয়া যায়। একটি ডোবায় গর্তের মধ্যে নিখোঁজ অন্য দুইজন ফোরকান ও মিজানুরের সঙ্গে মুরাদের লাশ পাওয়া যায়। তাদের শরীরে ছুরির আঘাতসহ মারাত্মক ধরনের জখমের চিহ্ন ছিল। তাদের কব্জিতে যে দাগ দেখা গিয়েছে তাতে একথা বোঝা যায় যে তাদের হাত রশি দিয়ে শক্ত করে বাধা হয়েছিল। মিজানুর ও ফোরকানের পরিবারও সংবাদ পেয়েছিল যে তাদেরকে ১৭ এপ্রিল RAB-এর গ্রেফতার করেছে। তারা যে RAB-এর হেফাজতে ছিল সেকথা RAB-এর স্বীকার করেনি, এবং ঘটনার জের ধরে বিষয়টি সম্পর্কে জানার জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তদন্ত করা হয়নি।

পুলিশ ও RAB-এর অভিযানে জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১১ সময়কালে নিহত কিংবা আহত হওয়া ব্যক্তির বিভাগওয়ারি চিত্র

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক উল্লেখিত সময়কালের সংবাদপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

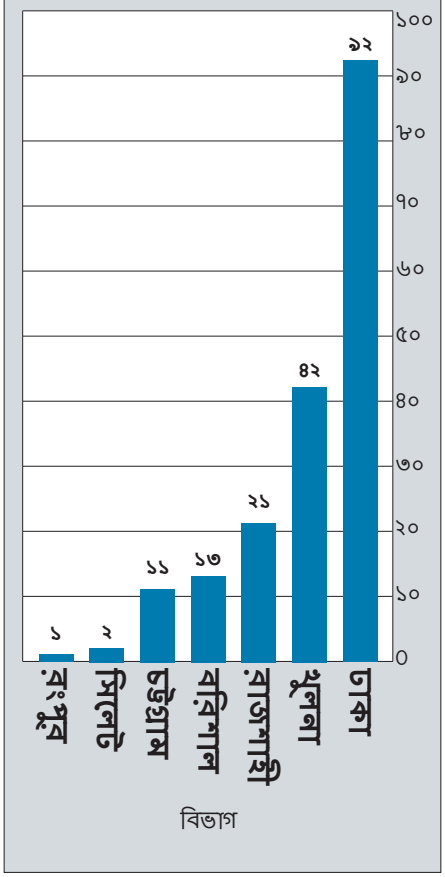

© প্রাইভেট

নির্যাতন

RAB-এর হাতে আটক ছিলো এমন সাবেক বন্দীরা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন যে, RAB-এর আটক বন্দীদের উপর নিয়মিতভাবে নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে পেটানো, লাথি মারা, ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা, খাবার ও ঘুমাতে না দেওয়া, এবং যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক বা বিদ্যুত স্রোত চালানো।

তারা জানিয়েছেন যে, বন্দীরা নিজেদেরকে অপরাধী "স্বীকার" না করা পর্যন্ত তাদের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। এই ধরনের ঘটনার শিকার এক ডজনেরও বেশি ভুক্তভোগী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে জানিয়েছেন যে, অপরাধ স্বীকার না করায় সেসময়ে তাদেরকে "ক্রসফায়ার" এর ভয় দেখানো হয়েছিল। "অপরাধ স্বীকার" করার পর তাদেরকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। পুলিশ RAB-এর কথামতো তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলা দায়ের করেছিল।

এই ধরনের ঘটনাগুলোতে ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তরের তারিখ RAB কর্তৃক গ্রেফতারের দিন থেকে ভিন্ন দেখানো হয়। এভাবে পুলিশ RAB-কে নথিপত্র নষ্ট করতে এবং তাদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোকে ধামাচাপা দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করছে।

© প্রাইভেট

উপরে বাঁ দিক থেকে: নাসির আহমেদ, আসদুজ্জামান রুবেল, মোহাম্মদ আসাদুল হোক শাহীন, সবাই RAB এর ক্রসফায়ার-এ নিহত হয়েছেন; মোহাম্মদ ইদ্রিস পুলিশের অত্যাচারে নিহত হয়েছেন; ঢাকা হাসপাতালে বাংলাদেশী সাংবাদিক মাসুম ফকির। তিনি জানিয়েছেন যে, ২২ অক্টোবর ২০০৯ গ্রেফতারের পর RAB কর্মকর্তারা তাকে নির্যাতন করেছে।

“আমাকে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এবং আমাকে বলা হচ্ছিল যে আমি যদি তাদের বলা কথার সঙ্গে একমত না হই তাহলে তারা আমাকে মেরে ফেলবে।”

রবিউল ইসলাম, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে RAB কর্মকর্তাদের নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন

“আমার মনে হচ্ছিল আমি মারা যাচ্ছি”

একত্রিশ বছর বয়সী রবিউল ইসলামকে সাদা পোষাকধারী কর্মকর্তারা খুলনার একটি হোটেল থেকে ২০০৯ সালের ২৪ অক্টোবর গ্রেফতার করে। চোখ বেধে ও হাতকড়া পরিয়ে তাকে শহরের খালিশপুর এলাকায় অবস্থিত RAB-এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এসময়ে তাকে পেটানো হয়, ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তার যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়।

তার সঙ্গে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কথা হয়েছে খুলনাতে।

“আমাকে একটি হুইলচেয়ারে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমার হাত-পাগুলো বেধে রাখা হয়েছিল। প্রথমে হুইলচেয়ারটি এমনভাবে ঘুরানো হয়েছিল যে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, ওই অবস্থাতে হুইলচেয়ারে রেখেই আমাকে পেটানো হয়। RAB-এর ৬ কার্যালয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়ার প্রায় ১০ মিনিট পরে একটি ছোট্ট কক্ষে আমাকে পেটানো শুরু করা হয়েছিল। তিনজনে মিলে আমাকে মেরেছে: তাদের একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন, যিনি সবাইকে আদেশ দিচ্ছিলেন; একজন আমাকে পেটাচ্ছিল; এবং তৃতীয়জন পেটাতে সাহায্য করছিল। আমার চোখ বাধা ছিল। প্রায় আধাঘন্টা ধরে আমাকে নির্যাতন করার পর হাতকড়া ও চোখ বাধা অবস্থায় মেঝেতে ফেলা হয়। এরপর তারা আমার চোখ খুলে দেয় এবং কিছু খাবার খেতে দেয়। খাওয়া শেষে আবারো আমার চোখ বেধে দেয় এবং হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। তবে এবার আর হুইলচেয়ারে নয় আমাকে মেঝেতে ফেলে রাখে।”

“পরদিন সকালবেলা ৭টা নাগাদ তারা আমাকে সকালের নাস্তা করার জন্য দুই মিনিট সময় দিয়েছিল। তারপর আবারো চোখ বেধে, হাতকড়া পরিয়ে আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। পুরো সময়টায় তারা আমাকে বলছিল, ‘আমরা জানি তোমার কাছে অস্ত্র আছে, অতএব তুমি একথা স্বীকার কর’। দ্বিতীয় জায়গায় আমাকে প্রায় ১৬দিন আটকে রাখা হয়। এসময়ে আমার হাতগুলো বেধে মাথার উপর রাখা হয়েছিল। অনেকটা ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখার মতো। এসময়ে আমাকে বারবার বলা হচ্ছিল যে, আমি যদি তাদের কথা মতো না চলি, তাদের বলা কথা স্বীকার না করি তাহলে আমাকে মেরে ফেলা হবে। দ্বিতীয় এই জায়গাতে আমাকে দুইবার কিংবা তিনবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এখানে শাস্তি হিসেবে মূলত আমাকে একেক দফায় একটানা প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। কোন একসময় তারা আমার পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক তার পেচিয়ে বৈদ্যুতিক শক দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল আমি মারা যাচ্ছি। এটা আমার নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছিল যে আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাব। প্রচন্ড ঝাঁকুনির পর আমি শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল।”

“অনেকদিন পরে, ২০০৯ সালের ৯ নভেম্বর আমাকে মোহাম্মদপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ আমার বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি মামলা রুজু করে। সেসময়ে পুলিশ আমাকে বলেছিল: ‘দেখো, আমাদের কিছু করার নেই। RAB আমাদেরকে তোমার বিরুদ্ধে এই মামলা করতে বলেছে।”

“মামলা রুজু হওয়ার পর আমাকে আদালতে চালান দেওয়া হয়; আদালতে পাঠানো নথি থেকে দেখা যায় যে আমাকে ৯ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে যদিও প্রকৃতপক্ষে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২৪ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে এবং RAB-এর জিম্মায় রাখা হয়েছিল। আমি এবিষয়ে প্রতিবাদ জানালাম, কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিল না। কয়েকদিন পরে আমাকে আবারো আদালতে হাজির করা হলো এবং সেখান থেকে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলো।”

“যদিও আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল খুলনাতে কিন্তু পুলিশের কাগজপত্রে দেখানো হয়েছে আমাকে ঢাকার মোহাম্মদপুর থানায় গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রায় সাড়ে ছয়মাস আটক ছিলাম। এরপর আদালত আমাকে জামিনে মুক্তি দেয়।”

“প্রতিমাসে আমাকে খুলনা থেকে ঢাকায় আদালতে হাজিরা দিতে যেতে হয়। আমার জন্য এটা বড় ধরনের আর্থিক বোঝাস্বরূপ।”

© শহিদুল আলম/দৃক/অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

ছবিটি শহিদুল আলমের বাংলাদেশের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ক্রসফায়ার থেকে নেয়া হয়েছে।

“এখন আমরা কোন ক্রসফায়ার করছি না। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।”

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নভেম্বর ২০০৯

রাষ্ট্রের দায়

বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আওয়ামী লীগ RAB-এর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে কোন ধরনের অঙ্গীকার প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একজন প্রার্থী হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধের অঙ্গীকার করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম কয়েকমাস তিনি বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে “একদমই সহ্য না করার (জিরো টলারেন্স)” নীতির কথা বলেছিলেন। অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ সেসময়ে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। এই ধরনের আশাপ্রদ পরিস্থিতি প্রথমবারের মতো ধাক্কা খেলো ২০০৯ সালের শেষ দিকে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কর্তৃপক্ষ দাবী করলেন যে, দেশে কোন বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনা নেই।

এই ধরনের প্রত্যাখান RAB-কে ন্যায়বিচার থেকে সুরক্ষা প্রদান করল, এবং প্রধানমন্ত্রীকে তার অঙ্গীকার পালন করা থেকে মুক্তি দিল। এটি RAB-এর কর্মকান্ডের দায়মুক্তির নবায়নের সমার্থক।

লোকদেখানো তদন্ত

RAB-এর অভিযানকালে মৃত্যুর ঘটনাগুলোর তদন্তের মূল দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত RAB নিজেই পালন করে থাকে। এটি সুস্পষ্টভাবে স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ। অভিযুক্ত পক্ষকেই যখন কোন অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের মূল নীতিগুলো খর্বিত হয়। অভিযুক্তরা তখন তথ্যপ্রমাণাদি ধ্বংসের স্বাধীনতা পায়, তারা নথিপত্র নষ্ট করতে পারে এবং তদন্তের ফলাফল তাদের মতো করে তৈরি করতে পারে। RAB-এর তদন্তের ফলাফল গোপন রাখা হয়; এবং তাদের তদন্তের ফলাফল বারবার একইরকম হয়ে থাকে। এযাবত্কালে RAB-এর যেসকল তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে জানা গিয়েছে সেগুলোতে কখনোই বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের জন্য RAB-কে দায়ী করা হয়নি; বরং এই ধরনের যতগুলো তদন্ত হয়েছে সবগুলোতে ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হয়েছে, তাদেরকে অপরাধী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুকে যথাযথ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন যে, “মৃত্যুর ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে আইন অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় তদন্ত দরকার ছিলো তা করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় কোন তদন্তেই RAB-এর গুলি ছোড়ার ঘটনা অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়নি”।

এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর হাতে মৃত্যুর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের যে ফলাফলগুলো ফাঁস হয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এবং দেখা গিয়েছে যে ফাঁস হওয়া তথ্যের সঙ্গে RAB-এর দাবী মিলছে না, তখনো সরকারি কর্মকর্তারা RAB-এর বক্তব্যকেই সমর্থন করছে বা অনুমোদন দিচ্ছে।

হাইকোর্ট ২০০৯ সালের নভেম্বরে সরকারের কাছে RAB-এর হেফাজতে আটক এক বন্দীর সন্দেহজনক বিচার বহির্ভূত হত্যার ব্যাখ্যা দাবী করে, যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সরকার RAB-এর হেফাজতে বন্দীর মৃত্যুর ঘটনা অস্বীকার করেছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন: “এখন আমরা কোন ক্রসফায়ার করছি না। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।”
জীবনের অধিকারের প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং জীবনের সুরক্ষা দিতে হবে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো যেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড না ঘটাতে পারে তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এলক্ষ্যে কি করতে হবে সেকথা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও চুক্তিগুলোতে বলা আছে, এর মধ্যে রয়েছে আইনের-অধিকারভুক্ত নয়, বিনা বিচারে ও সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর প্রতিরোধ ও তদন্ত বিষয়ক জাতিসংঘের নীতিমালা এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২০১০ সালের ১২ নভেম্বর গৃহীত এক সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রগুলোকে “বিচার-বহির্ভূত, সংক্ষিপ্ত বা বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ডের সকল সন্দেহজনক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করার”, এবং দায়ী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার ও গণ শুনানির ব্যবস্থা করার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ওই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আরো আহ্বান জানানো হয়েছে যে, ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারগুলোকে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ নিশ্চিত করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে এই ধরনের নীতিমালা বাংলাদেশে RAB-এর ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর সন্দেহজনক বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্তকালে প্রয়োগ করা হয়নি।

বাংলাদেশে অস্ত্র হস্তান্তর

বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও অত্যধিক বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পুলিশ ও RAB-এর অস্ত্র প্রস্তুতকারী অনেকগুলো দেশ থেকে পিস্তল, মেশিনগান, টিয়ার গ্যাস, গ্রেনেড লঞ্চার, হেলিকপ্টারসহ ব্যাপক ধরনের সামরিক ও পুলিশ উপকরণ পাচ্ছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চীন, চেক

© শহিদুল আলম/দৃক/মেজরিটি ওয়ার্ল্ড

প্রজাতন্ত্র, ইটালি, পোল্যান্ড, রাশিয়া ফেডারেশন, স্লোভাকিয়া, তুরস্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র।

এছাড়াও উইকিলিকসে ডিসেম্বর ২০১০ এ প্রকাশিত ঢাকাস্থ মার্কিন দুতাবাসের এক গোপন তারবার্তা থেকে জানা যায় যে, যুক্তরাজ্যের পুলিশ বিভাগ RAB-এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, কোন দেশ যখন জেনেশুনে এমন কোন বাহিনীর জন্য অস্ত্র বা অন্য কোন উপকরণ সরবরাহ করে যা পদ্ধতিগতভাবে মানবাধিকার লংঘনের কাজে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে সরবরাহকারীকেও ওই সহিংতাগুলোর দায়-দায়িত্ব কিছুটা হলেও বহন করতে হবে।

ছবিটি শহিদুল আলমের বাংলাদেশের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ক্রসফায়ার থেকে নেয়া হয়েছে।

© এপি ফটো/পাভেল রহমান

উপরে: RAB কর্তৃক সাংবাদিক মাসুম ফকিরের গ্রেফতার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৯। পৃষ্ঠা ৭ দেখুন।

সুপারিশমালা

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

- একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা। যে কমিটি ২০০৪ সাল থেকে চলে আসা বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন ও আটকের অস্বীকৃত ঘটনাগুলোর অভিযোগ দ্রুততার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও কার্যকরভাবে তদন্ত করবে।

- এই ধরনের তদন্তের ফলাফলকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা।

- দায়ী ব্যক্তিদের তাদের পদমর্যাদা কিংবা অবস্থান নির্বিশেষে ন্যায়বিচারের আওতায় নিয়ে আসা।

- সত্য প্রকাশ করা এবং মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের দাতাদের করণীয়:

- বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এবং এই ধরনের হত্যা বন্ধে ও দায়ী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে সরকারকে উৎসাহিত করা।

- বাংলাদেশে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত থাকা কারণ RAB ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীগুলো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের কাজে সেগুলো ব্যবহৃত হতে পারে।

AMNESTY INTERNATIONAL

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হলো বিশ্বের ১৫০ টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে আমাদের ৩০ লাখেরও বেশি সদস্য ও গ্রাহকদের একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, যারা সকল মানুষের জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসানের লক্ষ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে।

আমারা এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি যেখানে প্রতিটি মানুষ সবর্জনীন মানবাধিকার ঘোষনা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের মধ্যে নিবদ্ধ সমস্ত মানবাধিকার ভোগ করবে।

আমরা সরকার, রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থনৈতিক স্বার্থ কিংবা ধর্ম থেকে মুক্ত এবং আমাদের অর্থের যোগান আসে আমাদের সদস্যপদ থেকে এবং জনসাধারণের দান থেকে।

সূচি: ASA 13/005/2011
Bengali

আগস্ট ২০১১

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

amnesty.org